ভারতশিল্পের কায়ানির্মাণ — উনিশ শতক

স্বাতী ভট্টাচার্য*

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা। বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনের সে এক ক্রান্তিকাল। ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর শতাব্দী অতিক্রান্তপ্রায়। ইংরেজ শাসন ততদিনে কায়েম হয়েছে ভারতের বুকে, কিন্তু এদিক ওদিকে তখনও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে পর্তুগীজ, ফরাসি অথবা ওলন্দাজদের। এই একশ' বছরে ভারতীয় তথা বাঙালির জনজীবনে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে — রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে রাজারাজড়াদের রাজ্যপাট অবলুপ্ত, জমিদারী প্রথাও বিলুপ্তির প্রহর গুনছে। ইংরেজ শাসকদের ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন নিয়মের ফলে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা আইনত বন্ধ হল বটে কিন্তু ইংল্যান্ডের যন্ত্রে তৈরি জিনিসে ছেয়ে গেল বাংলা তথা ভারতের গৃহতল। সামাজিক অরাজকতা যা আঠারো শতকের শেষভাগে হাহাকার জাগিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে, তার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা দিতে লাগল ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। আর এই সামাজিক অবক্ষয়ের হাত ধরে একদিকে যেমন দেখা দিলেন উঠতি ধনী বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, নৈতিকতা বিবর্জিত একদল 'বাবু', যাঁরা পরিচিত বাবু কালচারের প্রতিভূ হিসাবে, তেমনই এই শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এবং সর্বোপরি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রামমোহন তাঁদের দূরদৃষ্টি দিয়ে যে নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করলেন, তারই অন্যদিক হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের স্বচ্ছতোয়া লোকধর্ম যা উদার এবং সহজ। রামমোহনের সতীদাহপ্রথা রদ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-দীনবন্ধু-প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নব নব রূপান্তর, এই সময়টিকে বাংলার নবজাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত করেছে। নবজাগরণ অর্থাৎ আরোপিত নিদ্রার বলয় ত্যাগ করে এক সাহসিক স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন — অথচ ভারত তো তখন পরাধীন, সে পরাধীনতা তো নিছক রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়, এক সাংস্কৃতিক আনুগত্যও বটে। এই "সাংস্কৃতিক পরাধীনতা একমাত্র তখনই হয় যখন নিজের ঐতিহ্যগত ভাবধারা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো চাপা পড়ে যায় তুলনামূলক বিচার অথবা প্রতিযোগিতা

* গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, কলকাতার সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের অধ্যাপক

ছাড়াই এবং একটা বিজাতীয় সংস্কৃতির নতুন পরিমণ্ডল"-এর ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যায় চেতনা ..... এই পরাধীনতাই হল চেতনার দাসত্ব, আর সেজন্যেই আধুনিক বিশ্বের সংস্পর্শে এই পরিবেশেই জেগে উঠেছিল নতুন সৃজনের চেতনা, ঘটেছিল স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, অথচ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে স্বদেশী ও বিদেশীর দ্বৈরথ চলেছিল সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই। হয়তো এই দুটি চেতনা পরস্পর অভিমুখী — একদিকে সংকীর্ণমনস্ক আত্মকেন্দ্রিক ইংরেজিশিক্ষিত, অনুগত 'ভদ্র' বাবুরা, অন্যদিকে ইংরেজিবর্জিত অগণিত মানুষ আর এরই মধ্যে আধুনিক মননের বিকাশ তথা আত্মচেতনার অর্ঘ্যদীপ হাতে শিক্ষিত, দূরদর্শী বিদ্বান, বুদ্ধিমান কিছু মানুষ যাঁরা নিজস্ব স্বদেশের অনুসন্ধানে ব্রতী। যে স্বদেশ আমাদের নয়, যে স্বদেশের নির্মাণ ও উপস্থাপন একান্তই বিজাতীয় শাসনের অজুহাতে সেই নির্মোক সরিয়ে তাঁরা খুঁজতে চাইলেন নিজস্ব ভারতবর্ষকে।

আর এই নির্মাণের ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতেই প্রয়োজন হল এক নতুন শিল্পের স্বদেশকে খুঁজে নেবার — যদিও এই কাজটি সহজ ছিল না মোটেই। কারণটা অবশ্য সহজবোধ্য — 'শিল্প' শব্দটির সঙ্গেই পরিচিতি ছিল না সাধারণ মানুষের, ভারতশিল্পের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় যে সব শিল্প নিদর্শন আজ দেশ বিদেশের মানুষের বিস্ময়ের স্মারক সেগুলি প্রায় সবই তখন ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। বিস্মৃতির ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছিল অজন্তার চিত্রকর্ম, অথবা ভাস্কর্যের অনন্যসাধারণ নানা নিদর্শন। স্থাপত্যকীর্তিগুলি আড়ালে ছিল না হয়তো, কিন্তু মধ্যযুগীয় ইসলামিক স্থাপত্যই প্রধানত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মুঘল বা রাজপুত অণুচিত্রের ধারাটি নীরবে পালা বদলের পালার অনুষঙ্গ হিসাবে চলে গেছিল আপাত বিস্মৃতির অন্তরালে।

আদত কারণটা অবশ্যই রাজনৈতিক আর সেই সূত্রেই রয়েছে দিক বদলের প্রাথমিক ইঙ্গিত। মুঘল আমল পর্যন্ত এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরও শিল্পীরা এদেশে ছিলেন মূলত রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতক থেকেই তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিপন্নতার আভাস পেয়ে ছড়িয়ে পড়েন ভারতবর্ষের নানা রাজদরবারে — রাজপুতানায়, উত্তর ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে, বিহারে, বাংলায়। স্থানীয় শিল্পের ভাষার সঙ্গে মুঘল শিল্পের পরম্পরা মিলে তৈরি হয় নানা রাজপুত ও দক্ষিণী পাহাড়ী শৈলীর সমৃদ্ধিই শুধু নয়, পাটনা কলম বা মুর্শিদাবাদ কলমের মত শিল্পধারাও। কিন্তু 'শিল্পী' অভিধাটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না তাঁদের, এইসব রাজদরবারে এসেও রাজা বা নবাবদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী ছবি আঁকাই চালিয়ে যান তাঁরা। শিল্প যে এককের সৃষ্টি বা দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও নিজেরই প্রয়োজনে এককভাবে শিল্পচর্চার মাধ্যমেও যে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা যায়, ভারতীয় ছবি আঁকিয়েদের এই চেতনার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটানোর বোধ বা সুযোগ, কোনোটাই ছিল না।

নবাব বা রাজাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সংক্রান্ত অ্যালবাম ছাড়াও প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র সমন্বিত কিছু অ্যালবামও পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ধারার ছবিগুলি

কিন্তু ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন ঘরানার পথিকৃৎ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তথা 'ওরিয়েন্টাল' জীবনযাত্রার প্রতি পাশ্চাত্য শিল্পীদের আকর্ষণ ছিল যেমন তীব্র, এইসব দরবারী শিল্পীরাও ক্ষীয়মান রাজশক্তির আনুকূল্যে চিত্রচর্চা করতে করতে অনুভব করছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাজধানী কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে এ জাতীয় চিত্রচর্চার প্রবণতা দেখা দেয়। ইংরেজ শাসন মোটামুটি স্থিতাবস্থা লাভ করার পরেই ভাগ্যান্বেষণ এবং অর্থ উপার্জনের জন্য একদল বিদেশী শিল্পী ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। এঁরা ছিলেন প্রধানত প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্র আঁকিয়ে। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম হজেস (১৭৪৪-৯৭) টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল (এঁরা ছিলেন কাকা-ভাইপো) অন্যতম। একগুচ্ছ এনগ্রেভিং একত্রে সঙ্কলন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই এঁরা প্রকাশ করে ফেললেন 'Select Views of India' (হজেস ১৭৮৬) 'Travels in India' (হজেস ১৭৯৩) 'Oriental Scenery' বা 'Views of Calcutta' (ড্যানিয়েলস ১৮০৮ ও ১৭৮৬) জাতীয় বেশ কয়েকটি অ্যালবাম। নামগুলি পড়ে যেমন মনে হচ্ছে এইসব অ্যালবামে সেইভাবেই অত্যন্ত দক্ষতা ও অনুপুঙ্খতার সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর, শহর, ভাঙা মন্দির, ঐতিহাসিক স্থানের বাড়িঘর, পথঘাট, নদীনালার দৃশ্যচিত্র আঁকা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এলেন জর্জ চিনারি, চার্লস ও ডয়েলি, সলভিন্স বা ফ্রেজার এর মত প্রফেশ্যনাল শিল্পীর দল। তাঁদের ছবিতে তাই এক ধরনের নাটকীয় উপস্থাপনা দেখা যায়, যার উদ্দেশ্য মূলত ব্যাপক বাণিজ্যিকরণ বললে ভুল হয় না।

অন্যদিকে জানা যায় একদল শিল্পীর কথা, যাঁরা নিজেরা শিল্পী হিসাবে সুখ্যাত না হলেও উচ্চবংশীয় ভারতীয়দের তেল রঙের কাজ শিখিয়ে অন্নসংস্থান করতেন। আবার তেল রঙের করণকৌশলে দক্ষ ইংরেজ প্রতিকৃতি শিল্পীরা উঠতি বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রমাণ সাইজের প্রতিকৃতি, তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি দাসদাসী বা নানা প্রমোদানুষ্ঠানের দৃশ্য (যেমন শিকার বা বাইজি নাচ, দুর্গাপূজা বা মেহফিল) আঁকাকেই করে নেন তাঁদের পেশা। টিলি কেটল যেমন এ ব্যাপারে ভারতীয় সদ্য ধনী ও অভিজাত বংশীয়দের পছন্দের তালিকার প্রায় শীর্ষে ছিলেন। অবসর সময়ে যাত্রা নাটকের (যা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল) সিন এঁকেও বাড়তি রোজগার করতেন কিছু শিল্পী। এসব কাজে অবশ্যই তাঁদের ভারতীয় সহযোগীদের সাহায্যের দরকার হোত। আর ইজেল বইতে বইতে তুলি ধরতেও শিখলেন তাঁরা। শিখলেন তেল রঙে ছবি আঁকার খুঁটিনাটি কখনও বা দেখে দেখে কখনও বা শিক্ষানবীশ হয়ে ধীরে ধীরে তেল রঙের ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠলেন ভারতীয় শিল্পীরা। তাঁরাও এবার তেল রঙে ছবি আঁকতে শুরু করলেন — এ ছবির চাহিদাও বেশি কারণ ইংরেজ কর্মচারীরা যে এদেশে দাসদাসীর ছবি পরিবৃত হয়ে কত সুখে আছেন, তাঁদের সেই জীবনযাত্রার স্বাদ না পেলেও ছবি দেখেও যাতে তাঁদের স্বদেশবাসী আত্মীয়রা তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত জীবন যাপনের আন্দাজ করতে পারেন, তার জন্যেও দরকার

কিন্তু ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন ঘরানার পথিকৃৎ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তথা 'ওরিয়েন্টাল' জীবনযাত্রার প্রতি পাশ্চাত্য শিল্পীদের আকর্ষণ ছিল যেমন তীব্র, এইসব দরবারী শিল্পীরাও ক্ষীয়মান রাজশক্তির আনুকূল্যে চিত্রচর্চা করতে করতে অনুভব করছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাজধানী কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে এ জাতীয় চিত্রচর্চার প্রবণতা দেখা দেয়। ইংরেজ শাসন মোটামুটি স্থিতাবস্থা লাভ করার পরেই ভাগ্যান্বেষণ এবং অর্থ উপার্জনের জন্য একদল বিদেশী শিল্পী ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। এঁরা ছিলেন প্রধানত প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্র আঁকিয়ে। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম হজেস (১৭৪৪-৯৭) টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল (এঁরা ছিলেন কাকা-ভাইপো) অন্যতম। একগুচ্ছ এনগ্রেভিং একত্রে সঙ্কলন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই এঁরা প্রকাশ করে ফেললেন 'Select Views of India' (হজেস ১৭৮৬) 'Travels in India' (হজেস ১৭৯৩) 'Oriental Scenery' বা 'Views of Calcutta' (ড্যানিয়েলস ১৮০৮ ও ১৭৮৬) জাতীয় বেশ কয়েকটি অ্যালবাম। নামগুলি পড়ে যেমন মনে হচ্ছে এইসব অ্যালবামে সেইভাবেই অত্যন্ত দক্ষতা ও অনুপুঙ্খতার সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর, শহর, ভাঙা মন্দির, ঐতিহাসিক স্থানের বাড়িঘর, পথঘাট, নদীনালার দৃশ্যচিত্র আঁকা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এলেন জর্জ চিনারি, চার্লস ও ডয়েলি, সলভিন্স বা ফ্রেজার এর মত প্রফেশ্যনাল শিল্পীর দল। তাঁদের ছবিতে তাই এক ধরনের নাটকীয় উপস্থাপনা দেখা যায়, যার উদ্দেশ্য মূলত ব্যাপক বাণিজ্যিকরণ বললে ভুল হয় না।

অন্যদিকে জানা যায় একদল শিল্পীর কথা, যাঁরা নিজেরা শিল্পী হিসাবে সুখ্যাত না হলেও উচ্চবংশীয় ভারতীয়দের তেল রঙের কাজ শিখিয়ে অন্নসংস্থান করতেন। আবার তেল রঙের করণকৌশলে দক্ষ ইংরেজ প্রতিকৃতি শিল্পীরা উঠতি বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রমাণ সাইজের প্রতিকৃতি, তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি দাসদাসী বা নানা প্রমোদানুষ্ঠানের দৃশ্য (যেমন শিকার বা বাইজি নাচ, দুর্গাপূজা বা মেহফিল) আঁকাকেই করে নেন তাঁদের পেশা। টিলি কেটল যেমন এ ব্যাপারে ভারতীয় সদ্য ধনী ও অভিজাত বংশীয়দের পছন্দের তালিকার প্রায় শীর্ষে ছিলেন। অবসর সময়ে যাত্রা নাটকের (যা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল) সিন এঁকেও বাড়তি রোজগার করতেন কিছু শিল্পী। এসব কাজে অবশ্যই তাঁদের ভারতীয় সহযোগীদের সাহায্যের দরকার হোত। আর ইজেল বইতে বইতে তুলি ধরতেও শিখলেন তাঁরা। শিখলেন তেল রঙে ছবি আঁকার খুঁটিনাটি কখনও বা দেখে দেখে কখনও বা শিক্ষানবীশ হয়ে ধীরে ধীরে তেল রঙের ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠলেন ভারতীয় শিল্পীরা। তাঁরাও এবার তেল রঙে ছবি আঁকতে শুরু করলেন — এ ছবির চাহিদাও বেশি কারণ ইংরেজ কর্মচারীরা যে এদেশে দাসদাসীর ছবি পরিবৃত হয়ে কত সুখে আছেন, তাঁদের সেই জীবনযাত্রার স্বাদ না পেলেও ছবি দেখেও যাতে তাঁদের স্বদেশবাসী আত্মীয়রা তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত জীবন যাপনের আন্দাজ করতে পারেন, তার জন্যেও দরকার

ছিল বাস্তবধর্মী ছবির। কাজেই দেখা যায় জোফানির মত ইওরোপীয় শিল্পী যখন হেস্টিংসের বা তাঁর স্ত্রীর ছবি আঁকছেন তখন 'অনুকরণ দক্ষ' ভারতীয় শিল্পীর ডাক পড়ছে নোকর, চাকর, মাছওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, হুঁকো বরদার বা পাল্কাপুলারদের প্রতিকৃতি আঁকার জন্যে। ধরা যাক স্যার ইলাইজা ইম্পের স্ত্রীর কথা — তাঁর ছিল এক চিড়িয়াখানা, হরেক রকম পশুপাখির মেলা সেখানে। আর তাদের 'প্রামাণিক' ছবি আঁকবার জন্যে বহাল হয়েছিলেন পাটনা কলমের তিন বিখ্যাত শিল্পী রাম দাস, ভবানী দাস ও জৈনুদ্দিন। এঁদের হাতে সূচনা হল মুঘল ঘরানায় ব্রিটিশ পদ্ধতিতে স্বচ্ছ জল রঙে আঁকা চিত্রশৈলীর।

কিন্তু এ তো গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। ফিরে আসি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবরণে। ততদিনে বেশ কিছু শিল্পী ব্রিটিশ জল রঙে ও তেল রঙে প্রতিকৃতিচিত্র ও নিসর্গচিত্র আঁকবার ধরনধারণ রপ্ত করে ফেলেছেন। সিন সিনারি ছাড়াও আঁকছেন দেবদেবীর ছবি যা 'বাবু'দের ঠাকুরদালানে শোভা পাচ্ছে। দেবদেবীর ছবি আঁকায় দক্ষতা কম লাগে, প্রতিযোগিতাও কম।

এই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তাই ধীরে ধীরে, হয়তো বা খানিকটা নিজের অজান্তেই বদলে যাচ্ছিল 'শিল্প ও শিল্পী'র সংজ্ঞা। 'সূক্ষ্ম শিল্প' বা Fine arts — খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন ঔপনিবেশিক শাসকেরা, ভারতীয় শিল্পীদের অধিকার সীমার বাইরে। কারণ এক, ভারতবর্ষে সূক্ষ্ম শিল্পের কোনও ঐতিহ্য নেই। কারণ দুই, এখানে সবাই পরম্পরা আঁকড়ে পড়ে থাকা কারিগর, যারা বড় জোর 'কপিয়িস্ট' বা 'ড্রাফটস্ম্যান' হিসাবে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন কিন্তু 'শিল্পী' অভিধা পাবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে ছবি ছাপা ও রঙ লাগানোর কাজ যথাযথ শিখে নিলেও তা কারিগরি কুশলতার প্রমাণ হিসাবেই ধরতে হবে। এবং কারণ তিন, 'শিল্পী' হবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় 'পরিপ্রেক্ষিত' বা আলোছায়ার জ্ঞান কোনোটাই তাঁদের নেই। ইওরোপ থেকে, বিশেষত সেইসব দেশ থেকে যাদের পতাকা তখনও ভারতের মাটিতে পোঁতা, যে সব তক্ষণ-পটু ছবি আঁকিয়েরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছিলেন তাঁরাই হলেন যথার্থ শিল্পী কারণ তাঁরাই তো আদতে সেই মহান ইওরোপীয় শিল্প ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

এঁদের প্রভাবে বা এঁদের অনুকরণেই বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ দেশীয় নাগরিক সমাজে 'শিল্পী' শব্দটি কিঞ্চিৎ অর্থবহ হয়ে উঠল। ততদিনে ইংরেজ শাসনের নাগপাশে, অন্তর্কলহে দেশীয় রাজ্যগুলি তথা রাজাদের মর্যাদা বা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তলানিতে ঠেকেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির শেষ অবস্থায় যেসব শিল্পীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোনায় দেশীয় ছোট ছোট রাজাদের ছত্রছায়ায় নিজেদের পরম্পরার সঙ্গে স্থানীয় শিল্পভাষা ও বিদেশী প্রভাব মিলিয়ে মিশিয়ে কষ্ট করে হলেও নিজস্ব ঘরানা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, এবার তাঁদেরও নামতে হল বদলে যাওয়া পালার আসরে।

বদলের এই দিকচিহ্নগুলি অষ্টাদশ শতক থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সে আলোচনার জন্যই এই পশ্চাদ্‌দৃষ্টি — প্রথাগত শিক্ষার চরিত্র যে বদলে গেছে, বদলে গেছে পৃষ্ঠপোষকদের মুখ, তার বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল গত শতাব্দীর হাওয়া বদলের সূত্রে। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন বা তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল — এক, ইউরোপীয় শৈলীতে আঁকা বাস্তববাদী চিত্রণই চিত্রকলার সর্বোচ্চ আদর্শ। দুই, নিজের ছবি এঁকে বা সাহেবদের প্রয়োজনীয় ছবি এঁকে তা বিক্রী করা যায়, এবং তিন, এজন্য শাসকদের/অন্য কর্মচারীদের দেশীয় আজ্ঞাবাহকদের খুশি করে কাজ আদায়ের/ অজুরা পাবার কৌশল আয়ত্ত করা দরকার। এবং আশ্চর্যের হলেও এর জন্যে বাড়তি কিছু অর্থ এবং সামান্য কিছু স্বীকৃতিও পাওয়া যেতে পারে। তবে কাজটা সহজ নয় কারণ মৌখিক ভাষার বাধা এবং প্রফেশ্যনাল আদব কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। তবু উনিশ শতকের প্রথম দু এক দশকের মধ্যেই দেখা গেল দরবারী শিল্পীদের বংশধরেরা ব্রিটিশ কায়দায় স্বচ্ছ জল রঙে আঁকতে থাকলেন নানারকম নিসর্গচিত্র, পুরাকীর্তি, মানুষজন ও পশুপাখির ছবি। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দরকার ছিল এদেশের ভৌগোলিক, জৈবিক, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রামাণ্য ছবি। কাজেই কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী ছবির যোগান দিতে নিযুক্ত হলেন একদল শিল্পী। তাঁরা আঁকলেন আগ্রা, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, বোম্বাই, মাদ্রাজের নানা পুরাকীর্তির ছবি। 'কপি' করলেন নানা নিসর্গচিত্র (যেমন, গঙ্গার দু ধারের দৃশ্য)। আবার কত জানা অজানা লতাপাতার ছবি এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনে মানুষের দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ 'কলকব্জা'র ছবি।

এ জাতীয় ফরমায়েশি কাজ ছাড়াও প্রায় সব ভারতীয় 'শিল্পী'ই সে সময় ভারতীয় জীবনযাত্রা ও স্থাপত্যকীর্তির গুচ্ছ গুচ্ছ ছবি আঁকতেন, যেগুলি ব্রিটিশরা নিয়ে যেতেন তাঁদের দেশে। শুধু ব্রিটিশরাই বা কেন, হাতির দাঁতের বা অভ্রের উপর করা ঐতিহ্যবাহী ঘরানায় আঁকা এইসব ছবি ইওরোপীয়দের কাছে মেমেন্টো হিসাবে দারুণ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য ১৮৫০ নাগাদ ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রে এ ধরনের ছবির বাজার অনেকটাই পড়ে যায়। একই সময়ে একদল শিল্পী শিখতে লাগলেন এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফির কৌশল, কারণ তুলনায় সহজ ও বহুউৎপাদক ছাপাই ছবির ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদার মধ্যে অনেক ভারতীয় শিল্পীই সাফল্যের চাবিকাঠি খুঁজে পেলেন।

দরবারী শিল্পীরা যেমন সম্রাটের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী ধরে রাখতেন, এইসব শিল্পীদের আঁকায় তেমনই ঘটল ভারতের সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পটবদলের নাটকীয় উন্মোচন। শুধু ভারতীয়দের জীবনযাত্রার ছবি নয়, নিছক ক্ষমতাবান উচ্চবিত্তদের ছবিই নয়, এইসব ছবিতে ফুটে উঠল সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোরও ছবি, জীবন ও জীবিকার তাগিদে যারা সহসা হয়ে উঠল 'Exotic India'র প্রতিভূ। আর ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিরা বা ভারতীয় পোশাক পরা কোম্পানীর কর্মচারীরাও ধরা রইলেন এইসব ছবিতে সামাজিক,

সাংস্কৃতিক রূপ বদলের বিষম ছন্দটির নিশ্চল সাক্ষী হয়ে।

তবু কিন্তু 'আর্টিস্ট' হিসাবে সম্মান বাঁধা রইল বিদেশী শিল্পীদের জন্যই। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দুটি লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হঠাৎ বড়লোকেরা যেরকম নিজেদের দেশীয় 'নেটিভ'দের থেকে উচ্চস্তরের ও শাসকদের 'প্রিয়' ও 'কাছের মানুষ' বলে মনে করতেন সেরকমই ইওরোপীয় শিল্পীদের কাছে শিক্ষা নেওয়া 'মধ্যবিত্ত' ও উচ্চবিত্ত শিল্পীরা নিজেদের 'আর্টিস্ট' বা 'শিল্পী' অভিধায় অভিহিত করতে লাগলেন। অন্যদিকে অল্পস্বল্প ইংরেজি বোঝা দু একটি ইংরেজি শব্দ বলতে পারা শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন এই 'শখের আর্টিস্ট'দের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও 'বাজার' ধরে রাখতে। এই সুবাদে ধনী ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিদেশ থেকে আনা পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের নানা নিদর্শনের বিশেষত রেনেসাঁ শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিন্টের কপি করতে করতে ভারতীয় শিল্পীরাও আস্তে আস্তে শিখে নিতে লাগলেন আলোছায়া ও পরিপ্রেক্ষিত এর কৃৎকৌশল। (যদিও এ চর্চা জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ মুঘল মিনিয়েচারেই রয়েছে কিন্তু মিনিয়েচারের শিক্ষাকে বড় ছবিতে, জল রঙের থেকে তেল রঙে উত্তরণে দরকার হল নতুন শিক্ষা)। আর এই ত্রিস্তরীয় বিভাজনের থেকে দূরে (অর্থাৎ বিদেশী শিল্পী, শিক্ষিত ধনী শিল্পী, ও বাজারী চাহিদার যোগানদার শিল্পী) থেকে গেলেন সেইসব artisan বা কারিগররা যাঁরা বাজারের চাহিদা ও রাজকর্মচারীদের পছন্দমত নানা 'সস্তাসুন্দর' জিনিসের যোগান দিতে গিয়ে ছাপাই ছবি থেকে জ্যামিতিক অঙ্কন সবেতেই হাত লাগাতেন। জনরুচির চাহিদা মেটানো সেইসব আঁকিয়ে বা গড়ে ওঠা নগরীর 'কালো শহরের' বাসিন্দে নেটিভদের রুচিমত 'পট'এর যোগানদারেরাও ছিল এই দলে। তারা এসেছিল গ্রাম থেকে শহরে কালিঘাট মন্দিরের আশেপাশে হয়তো বা দ্রুত কিছু অর্থ রোজগারের আশায়, অথবা নগরের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে তারা খুঁজতে চেয়েছিল বাঁচার রসদ। হয়তো এরা সবাই আদতে পটুয়া ছিল না, কেউ কেউ হয়তো ঠাকুর গড়ত, পুতুলও, সবাই হয়তো গ্রাম থেকে শহরে ভেসে আসা মানুষও নয় — অনেকেই হয়তো আদতে কলকাতারই পটুয়াটোলার বাসিন্দে, কিন্তু কলকাতা তখন এক অদ্ভুত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে নিত্যনতুন ভোলবদল। কালিঘাটে দেবদেবীর পটের চাহিদা ছিল চিরকালই কিন্তু তীর্থস্থান হিসাবে কালিঘাটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় পটুয়ারা ঠনঠনিয়ার পটুয়াটোলা থেকে পাট উঠিয়ে ডেরা বাঁধলেন কালিঘাটে। হয়তো তাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন গ্রাম থেকে আসা কিছু পটুয়া।

দেবদেবীর পট তো চেনা কিন্তু এবার কালিঘাটের সস্তা কাগজে ভেষজ রঙ দিয়ে আঁকা কালিঘাটের পটের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল সমকালীন সমাজ ও তার নানা বৈশিষ্ট্য বা বিচ্যুতি। পারিবারিক উৎসব থেকে নববাবুবিলাস, চিংড়ি মুখে বিড়াল থেকে এলোকেশী-মহান্ত সংবাদ — এক চলমান রঙ বদলের ছবি ধরা পড়ল তাদের

জোরালো লাইনে আঁকা রেখার সুডৌল বিন্যাসের ফিগারগুলি ও রঙের জেল্লাতে। কালিঘাট চিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে সমাজের বিলাসী অবক্ষয়িত জীবনচর্যার ব্যঙ্গাত্মক এই চিত্রায়ন সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এই পটশৈলীতে দেখা গেল দেশীয় চিত্রের বদলে যাওয়া ভাষার আর এক রূপ, এ যেন আজকালকার প্রচলিত ভাষায় 'urban desi' — শহুরে দেশজ শিল্প। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত যেমন লিখেছেন, "....তার সবচেয়ে বড় আবেদন ছিল তার জোরদার লাইন (যা তাঁরা দরকার মতো যৎসামান্য শেডিং দিয়ে ঠেকা দিতেন) এবং যে লাইন আদি যুগ থেকে ভারতীয় শিল্পের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। ... বিষয়বস্তু আর শিল্পগুণ যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন কালিঘাটের সেরা কাজের উদাহরণ হল তাদের আঁকা বাবু ও বিবিরা। ... আরও কতকগুলো ছবিতে দেখা যায় নারীকে আদ্যাশক্তি প্রতীকরূপে তার প্রভুত্ব দেখাতে। যেমন একজন সাক্ষাৎ মা-কালীর মতো, মাটিতে পড়ে থাকা পুরুষের দেহে, এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ..."

ইতিপূর্বে এঁদের আঁকা পটের চাহিদা ছিল দেবদালান সাজানোর জন্য। পটের গান শুনিয়ে জীবিকা অর্জনও করতেন তাঁরা। দেবদালানে তৈলচিত্রের সজ্জা ব্যবহৃত হবার পর তাদের অন্যতর পেশার কথা ভাবতে হল বাধ্য হয়ে। পটের গান বন্ধ হল, নতুন ভাষায় শুরু হল আঁকা, আর এই গানের পরিপূরক হয়ে উঠল বটতলার ছবি ও বই। সমাজের নানা কেচ্ছা কেলেঙ্কারির চটুল রঙ্গ রসিকতা, আদিরসাত্মক কাহিনীর শব্দচিত্র। তার সঙ্গে থাকত ছাপছবিও। কিন্তু বটতলার ছাপাই ছবি ছিল মূলত ইলাস্ট্রেশ্যন ধর্মী আর সেই ছবির উৎস বা অনুপ্রেরণা কিন্তু কালিঘাট পট নয়, পাটার ছবি বা চালচিত্র। বটতলার ছবিগুলিতে এই সচিত্রকরণ হত মূলত কাঠখোদাই অথবা ধাতুখোদাইয়ের সাহায্যে। লিথোগ্রাফির ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে এবং এই পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়ও হয়নি। কোনও কোনও ছবিতে শিল্পীর নাম থাকলেও অনেক ছবিতে শিল্পীর নাম নেই। সুকুমার সেন লিখছেন, "সেখানে খণ্ড চিত্ররীতি অনুশীলিত আছে দেবদেবী ও রাজারাজড়ার প্রতিমূর্তিতে, অন্যথা বইয়ের চিত্র সবই, পুঁথির পাটার রীতির সংক্ষিপ্ততর রূপান্তর।" এই সচিত্রকরণ সূত্রে কিন্তু আরও একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল — আর তা হল শিল্পীর কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে খানিকটা হলেও সচেতনতা। কালিঘাট পটের মূল গ্রাহক যেমন, এইসব বইয়ের মূল পাঠকও ছিলেন সাধারণ লোকেরা। তারাও কিন্তু এই পাঠের সূত্রে জানতে পারলেন — এদের নাম। প্রাপ্তি হিসাবে এর গুরুত্ব বুঝতে লেগে গেল আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর যখন প্রবাসীর মত বৌদ্ধিক পত্রিকা বা বসুমতীর মত জনপ্রিয় পত্রিকা পাতায় পাতায় সচিত্রকরণ ছাড়াও সেকালে প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির ছাপানো ফোটোগ্রাফ সমেত আত্মপ্রকাশ করল — ছবি পরোক্ষভাবে হলেও পৌঁছে গেল সাধারণ মানুষের অন্দরমহলে। আর বটতলার সহজলভ্য শীর্ণ বইগুলিকেই, আশ্চর্য হলেও, লেখা আর ছবির মেলবন্ধনের অন্যতম প্রাথমিক সূত্রধরের ভূমিকায় দেখা যায়। অন্যদিকে সামাজিক বিবেকের কাজ তো তাদের ছিলই। এ প্রসঙ্গে আর একবার

রাধাপ্রসাদ গুপ্তর মতামত স্মরণ করা যেতে পারে — "১৮৬০-৭০ থেকে ১৯০০ সাল অবধি বটতলা আর কালীঘাটের সামাজিক ছবির মূল কাজ ছিল গ্যাসালোকিত কলকাতার নিষ্কর্মা 'বাবুদের পেয়ারের বিবি, ছিনে জোঁক মেমসাহেব আর সাঙ্গো-পাঙ্গো ইত্যাদি নিয়ে উড়েনচণ্ডেমি আর বেলেল্লাগিরির কাণ্ড-কারখানাকে আর ধর্ম নিয়ে বুজরুকি ইত্যাদিকে চাবুক কষানো।" কিন্তু লক্ষণীয় যে উদ্দেশ্য এক হলেও কালিঘাট ও বটতলার ছবির আঙ্গিক কখনও পরস্পরকে তেমন প্রভাবিত করেনি।

ইতিহাসের ক্রমপর্যায়ের এই স্তরে এসে ভাবার দরকার আছে সেইসব শিল্পীদের কথা আদিকাল থেকে ভারতশিল্পের ধারাটিকে বহমান রাখার দায়িত্ব যাদের কাঁধে ন্যস্ত। 'লোকশিল্পী' উপাধিটি তাদের শিরোপা হয়নি তখনও। কৌলিক বৃত্তির পরিচয়ে তখনও এরা পটুয়া অথবা, তাঁতী, চর্মকার অথবা কর্মকার। যদিও পটের ডৌলে এসেছে বিদেশী গড়ন। বালুচরীর নকশায় ফুটে উঠছে চলন্ত রেলগাড়ি, ফিটনে বসা সাহেব মেম — কাঁথার নকশায় গ্রামের বধূর দেখা বদলে যাওয়া জীবনের জলছবি, নিজস্ব তাঁতে অনবদ্য নিজস্ব নকশায় দুবরাজ-এর মত কেউ সৃষ্টি করছেন অভিনব স্বাক্ষরিত বালুচরী শাড়ি, মনোহরণ করছেন শুধু স্বদেশীয়দের নয় — সাহেব মেমদেরও। পঞ্চানন কর্মকার এনগ্রেভিং এর পদ্ধতি আয়ত্ত করে ছবি ছাপছেন, তৈরি করছেন হরফ। কাঁসার কাজ, পেতলের কাজ, ফার্নিচারের ডিজাইন — বদলে যাচ্ছে সবই। বিদেশী ব্যবহারকারীদের পরিবর্তিত প্রয়োজন অনুযায়ী বাসন থেকে গয়না, কাংস্যবণিক থেকে স্বর্ণকার সবার কাজেই তখন ভোলবদলের অঙ্গীকার। ফলত শিল্পের দুনিয়ায় ঘটে যাচ্ছে এক নিঃশব্দ বিপ্লব — অস্তিত্বের সঙ্কটে মিলে যাচ্ছে সাহেবী 'সূক্ষ্ম শিল্প' ও ভারতের কারিগরি পরম্পরা। আর এই প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় বদলের ইতিহাস ঘাঁটবার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক সাহিত্যের সাক্ষ্যে তখনকার ছবির হাল হকিকত।

"... বাজারে যে তিন চারিখানি মনোহারী দোকান আছে, পূজা উপলক্ষে সেই সকল দোকানে নানারকম জিনিসের আমদানী হইয়াছে। দেশী বিলাতী ছবিতে দোকানের দেয়ালগুলি ঢাকা; কিন্তু ছবিগুলি সাজাইয়া টাঙ্গাইবার শৃঙ্খলার সীমা নাই। এক জায়গায় কালীঘাটের এক পয়সা দামের কালো রঙের পট; তাহার পাশেই হনুমান দুই হস্তে বক্ষঃবিদারণ করিয়া দেখাইতেছে — সেখানেও রামসীতার যুগলমূর্তি অঙ্কিত আছে। তাহার পরেই একখানি আর্ট স্টুডিওর ছবি, শিবের কপাল হইতে লাল রঙ্গের ছাঁটা বাহির হইয়া মদনভস্ম করিতেছে। তৃতীয় ছবি একখানা জার্মান 'ওলিওগ্রাফ', যুবতী অভিমান করিয়া একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। যুবকটিও প্রতিশোধপ্রদান-বাসনায় মান করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে। বিলাতী মানিনীর মানের মূল্য-পরিমাপক এই চিত্রের পাশেই একখানি রঙ্গদার ছবি — বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চতুর্থপক্ষের পত্নীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেছে আর ব্রাহ্মণী মা দুর্গা কর্তৃক অসুরের টিকি ধরিবার ভঙ্গীতে এক হাতে ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ টিকি আকর্ষণ করিয়া অন্যহাতে তাহার পৃষ্ঠে দিব্যাস্ত্র শতমুখী চালাইতেছে।" — দীনেন্দ্রকুমার

রায়ের 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থের এই বর্ণনায় যেমন ধরা পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজচিত্র তেমনই এই বর্ণনায় ছায়াপাত ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রচর্চার দেশী বিদেশী বহুধা সম্মিলনের। কীভাবে ধীরে ধীরে ছবির ভাষা সমাজের দলিল হয়ে উঠেছিল, কীভাবে ছবির বিষয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল প্রহসন, তামাশায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা তাও এক বিশেষ চর্চার বিষয়।

যে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন ও আগ্রহ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবাসীর সামাজিক ইতিহাসের সূত্র তুলে নিয়েছিলাম প্রবন্ধের সূচনায়, সেই তাগিদ থেকেই ইংরেজের শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা শুরু করলেন বিদেশী শিল্প ইতিহাসের পাঠ, পাশ্চাত্য দর্শনের পথিকৃৎদের মধ্যে মিল, বেন্থাম, নীৎশে, হেগেল, কান্ট — এঁদের মনন চর্চা যেমন একদিকে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল তাঁদের কাছে তেমনই শিল্প দার্শনিকদের ভাবনার পাঠও জরুরি বলে মনে করলেন তাঁরা। রাসকিন-এর ভাবনা এ সময়ের তরুণদের ওপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অভিজাত বংশীয়দের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রায় কোনও সংশয় ছিলই না। আর এ জন্যেই বাংলার তরুণেরা পশ্চিমী শিল্পের প্রকরণগত ভাষা আয়ত্ত করার জন্য ক্রমশ উদগ্রীব হয়ে উঠছিলেন। মনেপ্রাণে এই মহান শিল্পধারাকে আয়ত্ত করার জন্য তাঁরা অনুভব করছিলেন এক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এই তাগিদেই উনিশ শতকের ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে 'নতুন একটি চারুকলা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম ব্রাশ ক্লাব (Brush Club)।' এর পরিচালনায় আয়োজিত হয়েছিল দুটি প্রদর্শনী যথাক্রমে ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে, কলকাতার টাউন হলে। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম প্রদর্শনীটিতে টিলি কেটল, জর্জ চিনেরি প্রমুখ ভারতে কাজ করতে আসা বিদেশী শিল্পীদের কাজ দেখানো হয় কিন্তু দ্বিতীয় প্রদর্শনীটিতে রেমব্রান্ট টার্নার, ক্যানালোগে প্রভৃতি বিদেশী শিল্পীদের ছবি দেখানো হয় বলে জানাচ্ছেন কমল সরকার। এবং যথার্থভাবে তিনি বলছেন যে সর্বপ্রথম এই প্রদর্শনীই বিদেশী চিত্রকরদের ছবির সঙ্গে পরিচিত করান দেশের মানুষকে আর অনুমান করা যায় এটিই প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী। বিদ্যায়তনিক শিল্পচর্চার দ্বিতীয় পর্যায়ে নাম করতে হয় পঞ্চাশ দশকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত, প্রাচ্যবিদ ও কলকাতার বিদ্বজ্জনদের নিয়ে গড়ে ওঠা বেথুন সোসাইটির। এই বেথুন সোসাইটির বিদ্যোৎসাহিনী বিভাগ-এর উৎসাহে ও চেষ্টায়ই প্রথম শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। তবে এরও আগে ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডের মেকানিকস ইনস্টিটিউটের আদলে কলকাতায় মেকানিকস ইনস্টিটিউট নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে সেকালের নামী প্রতিকৃতি শিল্পী কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট চিত্রশিল্পী ছাত্রদের ছবি আঁকার রীতিনীতি শেখাতেন। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায় "কিছুদিন পরে ঐ মহৎসভা সাধারণের অনুরাগ বিরহে একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ....." — এ লেখা ১৮৪৭ সালের। যাই হোক এটা বোঝা যাচ্ছিল যে শিল্পশিক্ষার একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল জনগণের মধ্যে।

এমনই এক পটভূমিতে স্থাপিত হল কলকাতা আর্ট স্কুল। আগেই বলেছি ইওরোপীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব অবচেতনে মেনে নিয়েছেন সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা কাজেই সরকারি উদ্দেশ্য হিসাবে যখন বলা হল, 'কারিগর'দের অর্থাৎ যাঁরা পরম্পরাগতভাবে নানা কারুকলার সৃষ্টি করে চলেছেন (চারুকলার তো কোনও চর্চাই এদেশে হোত না কিনা!), তাঁদের শিল্পশিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেবার জন্যই এই স্কুল, তখন স্বভাবতই লোকে উৎসাহিত বোধ করল। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য মনে রাখা জরুরি। ১৮৫১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গ্রেট এক্সিবিশ্যনে ভারতীয় কারুকলার নকশা ও বৈচিত্র্য ইওরোপীয় রসিক মহলে আলোড়ন তুলেছিল যথেষ্ট। কাজেই ভারতশিল্পের নকশার বৈচিত্র্য ও কারিগরি দক্ষতার ব্যাপারটি ততদিনে স্বতঃসিদ্ধ। ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল "দ্য স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস"। ১৮৬৪ তে সরকার অধিগ্রহণের ফলে তার নাম হল "গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস"। প্রায় সমসময়েই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোরেও প্রতিষ্ঠিত হল একই ধরনের শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত পরিকাঠামোতে ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমির পাঠ্যক্রমের আদলে, সরকারি নীতি অনুযায়ী চলতে লাগল এই চারটি স্কুল — কালো মানুষদের শিল্প শিক্ষার নিরিখে সাদা মানুষদের বোঝা বহনের তাগিদে। শিল্পী তৈরি নয় — কী করেই বা শিল্পী হয়ে উঠবেন তাঁরা? পাঠ্যক্রমে তো ছাত্রদের নিজস্ব কল্পনা বিকাশের বড় একটা স্থান ছিল না। ব্রিটিশ ও ইওরোপীয় শিল্পকলার কিছু প্রিন্ট (যাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'high art') ছবি ও ভাস্কর্যের কিছু আসল ও কিছু কপি, অনুকরণ ও অনুসরণ করার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে থাকল মডেল হিসাবে। পাঠ্যক্রমে ছিল জ্যামিতিক ড্রইং, প্রতিকৃতি অঙ্কন, মডেলিং, লিথোগ্রাফি, এনগ্রেভিং ইত্যাদি বিষয়। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের বদান্যতায় অবশ্য একটি আর্ট গ্যালারি স্থাপিত হল আর্ট স্কুলের ছাত্রদের 'যথার্থ' শিল্পের সঙ্গে পরিচিতির আশায়। কিন্তু পাঠ্যক্রমে যাই থাকুক ছাত্ররা মূলত পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক ড্রইং ও স্টাডি এবং প্রাচ্যের আলঙ্কারিক শিল্পেই দক্ষ হয়ে উঠলেন। ফলে সার্ভে অফিসের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার জন্য এইসব শিক্ষিত শিল্পীদের ডাক পড়তে লাগল। ১৮৭০ থেকে কোনও কোনও ভাল ছাত্রকে (যেমন অন্নদাচরণ বাগচী) ছাত্রাবস্থাতেই আর্ট স্কুলের শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া হল। আবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশদের লেখা বই (যেমন ১৮৭২-এ Dr. Joseph Fayrer-এর লেখা 'The Thanatophidia of India') বা ভারতীয়দের গবেষণালব্ধ কোনও বই (যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্রর 'Antiquities of Orissa') সচিত্রকরণের দায়িত্ব আর্ট স্কুলের ছাত্রদেরই দেওয়া হোত। এ ছাড়াও সরকারি যাবতীয় মডেলিং চিত্ররচনা ও অলঙ্করণের দায়িত্বও এঁদের উপরেই বর্তাতো। আর এভাবেই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের গায়েও লাগানো হল 'দক্ষ অনুকরণকারী'দের তকমা।

তবে এই শিল্প শিক্ষানিকেতনের পাশ করা ছাত্রদের কাজের সঙ্গে যেহেতু জুড়ে ছিল শিক্ষার গন্ধ সেহেতু এঁরা এক অন্যতর শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে পড়লেন।

বাজারী 'স্বশিক্ষিত' শিল্পীদের থেকে এঁরা ছিলেন 'উচ্চবর্ণের' অথচ বিদেশী শিল্পীরাও এঁদের নিজেদের সমকক্ষ বলে ভাবতেন না। ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া অনেক সময়েই এঁদের পক্ষে টিকে থাকা ছিল দুষ্কর। একটা পথ অবশ্য অনেকেই বেছে নিতেন, তা হল প্রতিকৃতি অঙ্কন। আর্ট স্কুলের তদানীন্তন ভাইস প্রিন্সিপাল গিলার্ডি সাহেব দুঃখ করে একবার বলেছিলেন 'তেল রঙে প্রতিকৃতি আঁকা না শেখালে এত ছাত্র আর্ট স্কুলে আসতই না।' রবীন্দ্রনাথের মতেও সেযুগের আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোনও আকর্ষণই ছিল না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি স্বদেশী শিল্প ঐতিহ্যের স্বরূপও তো তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। ঔপনিবেশিক শক্তির লাগানো হীনমন্যতার বিষবৃক্ষ ততদিনে তাদের মনে মহীরুহের আকার নিয়েছে — স্বদেশী ঐতিহ্যের লুকিয়ে থাকা নিদর্শন খুঁজে নেবার উৎসাহ ও চর্চাও সেভাবে শুরু হয়নি তখন — ফলত

"The old Indian pictures and other works of art were laughed at by our students in imitation of the laughter of their European school masters of that age of Philistinism — they have had a long period of encouragement in developing an appetite for third rate copies of French pictures for gaudy oleographs abjectly cheap for the pictures that were products of mechanical accuracy of a stereotype standard and they still considered it to be symptoms of superior culture."

অতএব বোঝা যাচ্ছে 'মননের স্বরাজ' হারিয়ে ভারতবাসী তখন এক পরানুকরণের মোহে উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, হারিয়েছে আত্মসংস্কৃতির গৌরব, চতুর্দিকে প্রকট হয়ে উঠছে রুচির দৈন্য। যথার্থ শিল্পীর কদর নেই, কল্পনা সৃষ্টিশীলতার অর্থ বুঝবার প্রবণতা নেই তাদের। উপনিবেশের জনগণের নিজেদের জানবার, বুঝবার চেষ্টা সব সময়েই ঔপনিবেশিক শক্তিদের কাছে ভয়াবহ, আর তাই নানাভাবেই এক্ষেত্রেও আত্মবিকাশের বদলে আত্মঅবদমনের শিক্ষাই দেওয়া হতে লাগল। এ জন্যই আর্ট স্কুলের কৃতি ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী বা বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিছক প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পান, তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের অন্য দিকগুলির সম্ভাবনা অনালোচিতই থাকে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাণিজ্যিক ছবির অর্থাৎ তেলরঙে দেবদেবীর ছবির, বা ছাপাই ছবির (ওলিওগ্রাফ) সাহায্যে সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন এঁদের প্রতিকৃতি রচনা ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা রঙিন ছবির ওলিওগ্রাফে করা প্রতিলিপি, রবি বর্মার ওলিওগ্রাফ ছবিগুলোরও আগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গঙ্গাধর দে ও প্রমথনাথ মিত্রর কথাও উল্লেখ করতে হয়। গঙ্গাধর দে সম্বন্ধে 'অন্নদা জীবনী' (অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর জীবনচরিত) গ্রন্থ থেকে জানা যায় 'দে মহাশয় বাগচী মহাশয়ের চেয়ে প্রাচীন ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালীর মধ্যে

পাশ্চাত্যানুকরণে শিল্পশিক্ষা করে যশস্বী হয়েছিলেন।' প্রমথনাথ মিত্র 'স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আঁকা দ্বারকানাথ মল্লিকের প্রতিকৃতিটিই তাঁর কৃতিত্বের অনন্য স্বাক্ষর। তবে প্রতিকৃতি রচয়িতাদের মধ্যে শশীকুমার হেশ-এর নামও উল্লেখযোগ্য। শশীকুমার (১৮৬৯-?) ইওরোপে বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা লাভ করেন ইটালি ও জার্মানীতে। তাঁর প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরও বহু মনীষীর প্রতিকৃতি রয়েছে। এইসব নিত্যনতুন চাহিদার দাবি মেটাতে মেটাতে পাল্টে গেল এত দিনের অভ্যস্ত ছবির অবয়ব, ছবির আয়তন গেল বেড়ে, সংরচন অর্থাৎ কম্পোজিশন এর শৈলী হল অন্যরকম, এতাবৎকাল ঘন জলরঙে ছবি আঁকিয়ে শিল্পীরা শিখে নিলেন ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙ দিয়ে ছবি আঁকতে। হাতে তৈরি কাগজ ছেড়ে তারা বিলিতি সাদা কাগজ ব্যবহার করতে লাগলেন ছবির জন্যে। জন্ম নিল এক নতুন শিল্পভাষা — কোম্পানী শৈলী। যার মধ্যে প্রধান এই শৈলীর দুজন — কলকাতার ই. সি.দাশ ও শেখ মোহম্মদ আমির।

তবু এ পর্যায়ে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে প্রাথমিক শিল্পশিক্ষার ফলে ভারতীয় শিল্পের ভাষাও বদলাতে শুরু করল। ক্রমশই পাশ্চাত্য করণকৌশলের শিক্ষা নেমে এল মাটির কাছাকাছি। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কালিঘাট পটচিত্রের যে রমরমা বাজার ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তাদের বাজার পড়ে আসতে থাকে। কালিঘাট শৈলী ও বটতলার ছাপাই ছবির 'দেশী' চেহারার চেয়ে ব্রিটিশ ঘরানায় আঁকা পৌরাণিক ছাপাই ছবি অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পালটাতে থাকে ছবির ভাষা — হ্যাটকোট পরা সাহেব, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবু, বিদেশী আসবাবপত্রে সাজানো বার বিলাসিনীর ঘর, দেবদূত বা পরীর ছবি দিয়ে অলঙ্কৃত বটতলার ছাপাই ছবির তুলনায় আর্ট স্টুডিওর ছবিগুলি অনেক বেশি বাস্তবধর্মী। ১৮৭৮-৭৯ সাল নাগাদ অন্নদা বাগচী স্থাপন করলেন আর্ট স্টুডিও। আর্ট স্টুডিওর পৌরাণিক চিত্রগুলি বাস্তববাদী রীতির ছবির এক দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন সৃষ্টি করল। ফিগারগুলির আকর্ষণীয় বাস্তবোচিত গড়ন, পেশীর দৃঢ়তা, পশ্চাৎপটের গভীরতা এই ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরও লক্ষণীয় এই ছবিগুলিতে সমকালীন স্থাপত্যের ব্যবহার। প্রায় স্টুডিওতে তোলা ছবির মত নির্দিষ্ট নিসর্গ দৃশ্যের বা শহুরে বাড়িঘরের প্রেক্ষিতে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করা হোত। ফলত যমের সঙ্গে হারকিউলিস বা দময়ন্তীর সঙ্গে ভেনাসের সাদৃশ্য বোধহয় খুব একটা সুদূরপরাহত ছিল না। তবে মূর্তিতত্ত্ব ও রিয়ালিজমের এই মিশ্রণ যে ছবির নান্দনিক গুণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল এ কথা বলা যায় না। তাছাড়াও ঝলমলে পোশাক, দেবদেবীদের একাধিক মাথা ও হাতের অভিনব উপস্থাপনে আর্ট স্টুডিওর ছবিগুলি দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। শতাব্দীর শেষের দিকে কাঁসাড়িপাড়া, চোরবাগান, পাথুরেঘাটা, বৌবাজার অঞ্চল থেকে যে সমস্ত ছবি ছাপা হোত আস্তে আস্তে সেখানেও পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির ছাপ পড়ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এক দিকে ব্রিটিশ তৈলচিত্রের, বিশেষত রেনেসাঁ ও নিও ক্ল্যাসিকাল ছবির প্রতিলিপি ও অন্যদিকে চিৎপুর ও গরানহাটার শিল্পীদের আঁকা হিন্দু দেবদেবীদের তৈলচিত্র যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠল তেমনই আবার বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি বর্মার ছবিও বিপুল প্রচার লাভ করল। অবশ্যই দুজনের ছবির গুণগত মান এক নয় কিন্তু বাস্তববাদী রীতি ও রঙিন পৌরাণিক ছবি হিসাবে আর্ট স্টুডিওর ছবির সঙ্গে এগুলির তফাত সহজেই লোকের চোখে পড়ে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে লোকের চোখের সামনে তৈরি হয়ে উঠল নতুন চিত্ররীতি যা বাস্তব রীতির অনুসারী, কিছু টাইপ চরিত্রের সমাবেশে এক নতুন মাধ্যম হিসাবে বিবর্তিত হল।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীতে খানিকটা হলেও পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল — স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে দেশভক্তির সঙ্গে মিলে গেল শিকড় সন্ধানের আকুতি — ইংরেজ বন্দনার প্রায় সমান্তরালে ঠাকুর পরিবার ও সমমনস্ক পরিবারগুলি নারী পুরুষ নির্বিশেষে উদ্যোগী হলেন নতুন আলোয় পথ চিনতে। শিল্পের মননের দিক, আদর্শের দিক কী হবে, ভারতশিল্পের স্বরূপ কী হওয়া উচিত ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণের এই সুসময়ে তা নিয়েও বিস্তারিত আলাপ আলোচনার সূচনা হল। সচেতন প্রয়াসে আবিষ্কৃত হতে লাগল ভারতশিল্পের উজ্জ্বল নানা নিদর্শন। ভারতবর্ষময় প্রত্ন-সামগ্রী পুথিপত্রের সন্ধান, সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল সব সৃষ্টি সম্পাদনা করে প্রকাশ, সজীব লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসাজশ — এসব চর্চায় আগ্রহী বহু মনীষীর তখন অভ্যুদয় হয়েছিল।

ফলত ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার পথিকৃৎরা আন্তরিক প্রয়াসে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এক অন্যতর সাংস্কৃতিক বয়ান যা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছিল ক্রমশ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, গণপতি শাস্ত্রী যেমন তাঁদের বিপুল শ্রম ও মেধার সাহায্যে 'আবিষ্কার-সংগ্রহ-বিচার-বিবেচনার বিষয়-পরিধি'র মধ্যে শিল্পকলাকে নিয়ে এলেন তেমনই আবার আর্ট স্কুলের কৃতি ছাত্র জ্যামিতিক ড্রইং-এর শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানি লিখলেন 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি' নামে একখানি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বই, যেটিকে প্রথম শিল্প ইতিহাসের বই বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

আর্ট স্কুলের ইতিহাসেও ততদিনে সূচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়। ১৮৯৬ সালে আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে এলেন ই. বি. হ্যাভেল। এর আগে ছিলেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে — তখন পরিচয় হয়েছিল পরম্পরাগত শৈলীর অনুসারী কিছু শিল্পীর সঙ্গে। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে তাঁদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তও করেছিলেন তিনি। ঐতিহ্যবাহী নকশা সংগ্রহের সূত্রেও এইসব শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে ধীরে ধীরে তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল ভারতশিল্পের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগ। কলকাতা আর্ট স্কুলের দায়িত্বে এসে তিনি দেখলেন সেখানে শিল্পশিক্ষার বিশদ আয়োজন কিন্তু মনের তাগিদ জাগানোর কোনও উপকরণ নেই। নেই শিল্পশৈলী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার কোনও

সুযোগ। ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে চলে চিত্রশিক্ষা কপি করতে হয় বিদেশী ছবির প্রিন্টের। ঢেলে সাজাতে চাইলেন তিনি শিল্পশিক্ষাক্রম — নতুন ভারতীয় কারুশিল্প ও চিত্রশিল্প দিয়ে সাজালেন আর্ট গ্যালারি। বিদায় করে দিলেন আগের শিল্প নিদর্শন। ফেলে দেওয়া ছবি বিপুল অর্থের বিনিময়ে পুরনো শিল্পনিদর্শন যোগান দেবার মানুষের অভাব হল না। ঐ টাকা দিয়ে তিনি দেশের নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন মুঘল অণুচিত্র, নেপালি বৌদ্ধমূর্তি, নানা রকম বস্ত্রশিল্পের সম্ভার — আরও কত কী। ভারতশিল্পের চর্চা শুরু করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। বহু ছাত্র স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত স্কুল ছেড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি, কারণ তাঁর এবং অন্যান্য ছাত্রদের মনে হতে থাকে ভারতশিল্পের শিক্ষার সূচনা করে তাঁদের বিদেশী শিল্পশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। হ্যাভেল কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজ দেখে ভাল লাগল তাঁর। তিনিও যে তখন ভারতশিল্পের 'উদ্দিশ' খুঁজছেন। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই আর্ট স্কুলেরই ছাত্র। ১৯০৫ সালে সেই আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ হিসাবে তাঁকে নিয়ে এলেন হ্যাভেল সাহেব। শতাব্দীর নতুন সূর্যের আলোয় রচিত হল ভারতশিল্পের নব অধ্যায়।

আধুনিকতার অর্থ যদি সমকালীনতার তাগিদে বাঁক ফেরা বা নতুন পথে চলা হয় তবে এই পর্যায় থেকেই ভারতশিল্পের ভাষা নতুন বাঁক নিল। আবার বাঁক নেবার পর যেরকম নদী নানাভাবে বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন পথ ধরে, তারও সূচনা হল এই সময়েই। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের অঙ্গনে যে দিকবদলের সূচনা করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব খোঁজ ছিল অনেকখানি। ইওরোপীয় প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও সে ছিল মূলত তাঁর একক শিক্ষা নিজস্ব চাহিদায় গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে যা আত্মস্থ করেছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনের সূচনালগ্নে ঠাকুর পরিবারের বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে আত্মআবিষ্কারের লগ্নে, তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল বিদেশী রীতিতে ছবি আঁকা। বিদেশী ছবি দেখার অসুবিধা ছিল না, সেসময়ে তো চারদিকেই বিদেশী ছবির ছড়াছড়ি — একটা সরকারি আর্ট স্কুল ছাড়াও ১৮৯৫ সালে সূচনা হয়েছে 'ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল'-এর, সব জায়গাতেই পাশ্চাত্য চিত্ররীতির জয়জয়াকার। কিন্তু তাঁর মনে কাজ করে এক স্বাভাবিক অতৃপ্তি, অভাববোধ, এক অন্তর্গত তাড়না, তাঁর সৃজনবিশ্বের যথার্থ প্রকাশভঙ্গী নিয়ে। শতাব্দীর এপার থেকে আজ মনে হয় তদানীন্তন শিল্পশিক্ষার 'মডেল' কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র হলে তাঁর মধ্যে এই অভাববোধ তৈরি হোত কি? তিনি কি তখনও এমনই আকুল হয়ে ভারতশিল্পের হদিশ খুঁজতেন? তাঁর নামের সঙ্গে পুনরুজ্জীবনবাদী তকমাটি এমন অমোঘভাবে এঁটে গেছে যে সহজ সত্যটি আর অনেকেরই চোখে পড়ে না। প্রথমত অন্ধকারে নতুন পথ খুঁজতে গেলে পেছনের দিকে তাকাতে হয় বইকি? ভারতশিল্পের নতুন পথ সৃজনের স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব নিয়ে পরাধীন ভারতের এই শিল্পী তাই প্রাচীন

ভারতশিল্পের যেটুকু ছড়ানো ছিটোনো নিদর্শন পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তাঁর শিল্পের স্বদেশকে — এ ছাড়া তাঁর ছিল এক চির-রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণ মন — মুঘল অণুচিত্র বা রাজপুত অণুচিত্রর আদলে আঁকা তাঁর ছবিগুলির সঙ্গে মূলগত কোনোই পার্থক্য নেই 'রাজকাহিনী'র কাহিনীচিত্রের। কাজেই ঐ ঘরানার চিত্রশৈলী যে তাঁর মনোহরণ করবে, তা বলাই বাহুল্য — বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার বাতাবরণে যখন মননশীল শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই নানাভাবে আত্মআবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী তখন এই স্পর্শকাতর, শিল্পীমনের কল্পনাপ্রবণ মানুষটি কি সেই মাতনে সাড়া না দিয়ে পারেন? ১৮৯৫ নাগাদ যখন তিনি কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকছেন তখন তাঁর একটাই উদ্দেশ্য — দেশীমতে ছবি আঁকতে হবে। রবিবর্মা বা বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বাভাবিকতার রীতিতে দক্ষ শিল্পীদের কাজ তাঁর মন ভোলায়নি। ঘরোয়া লেখার সময়ে দূরবীনের উলটো দিক দিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর সময়ের দোলাচল নিয়ে তাঁর উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে — "রবিবর্মাও তো দেশীমতে ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু বিদেশীভাব কাটাতে পারেননি। সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হল আমার পালা।" কিন্তু সে খোঁজার শেষ তো একদিনে হয়নি। একইরকম নির্মমতায় নিজের শুক্লাভিসার ছবিটি সম্বন্ধে বলেছেন — "মনে হচ্ছে শীতের রাত্তিরে মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে" ছেড়ে দিয়েছেন অভিসারের পথে।

তিনি বলছেন, "ছবি তো এঁকে যাচ্ছি কিন্তু মন ভরছে কই? কি করি ভাবছি রোজই ভাবি কি করা যায়।" এমন সময়ে এক আশ্চর্য সমাপতনের মত কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষর দায়িত্ব নিয়ে এলেন ই. বি. হ্যাভেল। মিলে গেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। হ্যাভেল তাঁর বিশ্বাসে অনড় — ভারতশিল্পের ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েই সৃষ্টি করতে হবে নব্য ভারতীয় শিল্পভাষা। আর সেজন্যই তাঁর ভারতীয় সহকারীকে নিয়ে ভারতশিল্পের পথ খুঁজতে উদ্যোগী হলেন তিনি। হ্যাভেল ছিলেন তাত্ত্বিক। ভারতশিল্পের ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ ও আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। আগ্রহী ছিলেন তার নন্দনের নির্মাণেও। তাঁর প্রয়াসের গুরুত্ব শতাব্দীর এপার থেকে ভ্রান্তিকর মনে হলেও আদর্শগতভাবে হয়তো ভুল ছিল না। প্রাচ্যশিল্পের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা তাঁকে হয়তো অতীতমুখী করেছিল, সেখান থেকেই ছেঁড়াতার জোড়া লাগানোর কথা ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ভাবনার গোড়ার কথাটি একেবারেই ধ্রুবসত্য — পথ যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানে শেষ পথের সূত্রটি ধরেই তো শুরু করতে হবে খোঁজ। আর সেভাবেই অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে যাত্রা শুরু করলেন একদল তরুণ শিল্পী — তাঁদের মননে "আধ্যাত্মিকতা-ধর্ম-শিল্পকলার নন্দন একাকার করে প্রাচ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন" করে "নবীন জাতীয় শিল্পে সেই পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব দৃঢ়মূল" করে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, ওকাকুরা, কুমারস্বামী এবং সর্বোপরি হ্যাভেল। আজকের দৃষ্টিতে এর মধ্যে আবেগের তারল্য, যুক্তির ভ্রান্তি ধরা পড়লেও সে উন্মাদনার স্বাজাত্যবোধের যুগের একমাত্র পরিপূরক হয়ে

উঠেছিল এই নন্দনবোধ। যদি পাশ্চাত্য শিল্প আপন পরিচয়ে দাঁড়াতে পারে তবে ভারতীয় আধুনিক চিত্রভাষার ভিত্তিও হবে তার আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্য। কুমারস্বামী বললেন আমাদের আর্ট স্কুলগুলির যথার্থ কাজ হবে "ঐতিহ্যের ছিন্ন সূত্রগুলি খুঁজে আবার বাঁচিয়ে তোলা।" শ্রীঅরবিন্দের মতে, "... এই শিল্পে জীবনকে দেখা হয়ে থাকে আত্মার নিবিড়তায়" এবং তাই তাঁর ঘোষণা "The spirit of old Indian Art must be revived."

কিন্তু এই শিল্পীদের পাশাপাশি কাজ করছিলেন আরও একদল শিল্পী বাস্তবানুগ তেল রঙে। জুবিলি আর্ট স্কুল, ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মত গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলেও অ্যাকাডেমিক চিত্রচর্চার ধারাটি অব্যাহত। একইভাবে আধ্যাত্মিকতা ধর্মের মোড়কে মোড়া শিল্পাদর্শের বিরোধী স্বরও শোনা যায় সুকুমার রায়-এর মত দূরদর্শী কিছু শিল্পবেত্তার কণ্ঠে — নিশ্চিত প্রত্যয়ে তিনি বলেন "চিত্রের ভাষা মূলত এবং স্বভাবতঃ বিশ্বজনীন।"

এ তো শুধু বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বের কথা — স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আরও চার দশকে বারে বারে বদলেছে শিল্পের ভাষা — সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে শিল্পীর আত্মানুসন্ধান সামগ্রিক থেকে একক সংকটে উত্তীর্ণ হয়েছে বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতায়। সভ্যতার সংকটের মুখোমুখি হতে হতে ভারতশিল্পের আধুনিকতার সন্ধান সম্পূর্ণ হয়েছে চিত্রে, ভাস্কর্যে, আবার লোকশিল্পেও। নন্দনের নতুন কাঠামো নির্মাণ হয়েছে। স্বদেশমাতার মূর্তির বদলে সেখানে নির্মাণ হয়েছে স্বদেশী বিশ্বের মূর্তি — কিন্তু সে জটিল ও দীর্ঘ যাত্রার বিবরণ অপেক্ষা রাখে ভিন্ন এবং বিস্তারিত অন্যতর এক বয়ানের।

(এই লেখার বাকি অংশ শিল্পকলা সিরিজের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)